বারবাড়িতে

BANGLADARSHAN.COM

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥বারবাড়িতে॥

সে কা লে র নি য় ম অনুসারে একটে বয়েস পর্যন্ত ছেলেরা থাকতেম অন্দরে ধরা, তার পর একদিন চাকর এসে দাসীর হাত থেকে আমাদের চার্জ বুঝে নিত। কাপড় জুতো জামা বাসন-কোসনের মতো করে আমাদের তোশাখানায় নামিয়ে নিয়ে ধরত; সেখান থেকে ক্রমে দপ্তরখানা হয়ে হাতে-খড়ির দিনে ঠাকুরঘর, শেষে বৈঠকখানার দিকে আস্তে আস্তে প্রমোশন পাওয়া নিয়ম ছিল।

রামলাল যতদিন আমার চার্জ বুঝে নেয় নি ততদিন আমি ছিলেম তিন তলায় উত্তরের ঘরে। সেইকালে একবার সূর্যগ্রহণ লাগল—থালায় জল রেখে সূর্য দেখে একটা পুণ্য কাজ করে ফেলেছিলেম সেদিন। মনে পড়ে সেই প্রথম একটা ছাতে বার হয়ে আকাশ দেখলেম—নীল পরিষ্কার আকাশ তারই তলায় একটা পুকুর—আমাদের দক্ষিণের বাগানের এইটুকুই চোখে পড়ল সেইদিন।

এই দক্ষিণের বাগান ছিল বারবাড়ির সামিল—বাবুদের চলাফেরার স্থান। এখন যেমন ছেলেপিলে দাসী চাকর রাস্তার লোক এবং অন্দরের মেয়েরা পর্যন্ত এই বাগান মাড়িয়ে চলাফেরা করে, সেকালে সেটি হবার জো ছিল না। বাবামশায়ের শখের বাগান ছিল এটা—এখানে পোষা সারস পোষা ময়ুর—তারা কেউ হাঁটুজলে পুকুরে নেমে মাছ শিকার করত, কেউ প্যাখম ছড়িয়ে ঘাসের উপর চলাফেরা করত। তিন চারটে উড়ে মালিতে মিলে এখানে সব শখের গাছ আর খাঁচার পাখিদের তদবির করে বেড়াত, একটি পাতা কি ফুল ছেঁড়ার হুকুম ছিল না কারো। এই বাগানে একটা মস্ত গাছ-ঘর—সেখানে দেশ-বিদেশের দামী গাছ ধরা থাকত। পদ্মফুলের মতো করে গড়া একটা ফোয়ারা—তার জলে লাল মাছ, সব আফ্রিকা দেশ থেকে আনানো, নীল পদ্মপাতার তলায় খেলে বেড়াত। বাড়িখানা একতলা দোতলা তিনতলা পর্যন্ত, পাখিতে গাছেতে ফুলদানিতে ভর্তি ছিল তখন।

BANGLADARSHAN.COM

মনে পড়ে দোতলায় দক্ষিণের বারান্দার পুবদিকে একটা মস্ত গামলায় লাল মাছ ঠাসা থাকে, তারই পাশে দুটো শাদা খরগোশ, জাল-ঘেরা মস্ত খাঁচার মধ্যে সব ছোটো ছোটো পোষা পাখির ঝাঁক, দেওয়ালে একটা হরিণের শিঙের উপর বসে লালঝুঁটি মস্ত কাকাতুয়া, শিকলি-বাঁধা চীন দেশের একটা কুকুর—নাম তার কামিনী—পাউডার এসেন্সের গন্ধে কুকুরটার গা সর্বদা ভুরভুর করে। তখন বেশ একটু বড়ো হয়েছি, কিন্তু বৈঠকখানার বারান্দায় ফস্ করে যাবার সাধ্য নেই, সাহসও নেই। এখন যেমন ছেলেমেয়েরা ‘বাবা’ বলে হুট্ করে বৈঠকখানায় এসে হাজির হয় তখন সেটা হবার জো ছিল না। বাবামশায় যখন আহারের পর ও-বাড়িতে কাছারি করতে গেছেন সেই ফাঁকে এক-এক দিন বৈঠকখানায় গিয়ে পড়তেম। ‘টুনি’ বলে একটা ফিরিঙ্গী ছেলেও এই সময়টাতে পাখি চুরি করতে এদিকটাতে আসত। পাখিগুলোকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়ে, জালে করে ধরে নেওয়া খেলা ছিল তার। টুনিসাহেব একবার একটা দামী পাখি উড়িয়ে দিয়ে পালায়। দোষটা আমার ঘাড়ে পড়ে। কিন্তু সেবারে আমি টুনির বিদ্যে ফাঁস করে দিয়ে রক্ষে পেয়ে যাই। আর-একদিন—সে তখন গরমির সময়—দক্ষিণ বারান্দাটা ভিজে খসখসের পরদায় অন্ধকার আর ঠাণ্ডা হয়ে আছে; গামলা ভর্তি জলে

পদ্মপাতার নীচে লাল মাছগুলোর খেলা দেখতে দেখতে মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি জোগাল। যেমন লাল মাছ, তেমনি লাল জল গুলে দিতে দেরি হল না, জলটা লালে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু মিনিট কতকের মধ্যেই গোটা দুই মাছ মরে ভেসে উঠল দেখেই বারান্দা ছেড়ে চোঁ চোঁ দৌড়—একদম ছোটো পিসির ঘরে। মাছ মারার দায় থেকে কেমন করে, কিভাবে যে রেহাই পেয়েছিলাম তা মনে নেই, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত আর দোতলায় নামতে সাহস হয় নি।

মনে আছে আর-একবার মিস্ত্রি হবার শখ করে বিপদে পড়েছিলেম। বাবামশায়ের মনের মতো করে চীনে মিস্ত্রিরা চমৎকার একটা পাখির ঘর গড়ছে—জাল দিয়ে ঘেরা একটা যেন মন্দির তৈরি হচ্ছে, দেখছি বসে বসে। রোজই দেখি, আর মিস্ত্রির মতো হাতুড়ি পেরেক অস্ত্রশস্ত্র চালাবার জন্য হাত নিসপিস করে। একদিন, তখন কারিগর সবাই টিফিন করতে গেছে, সেই ফাঁকে একটা বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে মেরেছি দু-তিন কোপ। ফস্ করে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগায় বাটালির এক ঘা! খাঁচার গায়ে দু-চার ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ল। রক্তটা মুছে নেবার সময় নেই—তাড়াতাড়ি বাগান থেকে খানিক ধুলো বালি দিয়ে যতই রক্ত থামাতে চলি ততই বেশি করে রক্ত ছোটে। তখন দোষ স্বীকার করে ধরা পড়া ছাড়া উপায় রইল না। সেবারে কিন্তু আমার বদলে মিস্ত্রি ধমক খেলে—যন্ত্রপাতি সাবধানে রাখার হুকুম হল তার উপর! কারিগর হতে গিয়ে প্রথমে যে ঘা খেয়েছিলেম তার দাগটা এখনো আমার আঙুলের ডগা থেকে মেলায় নি। ছেলেবেলায় আঙুলের যে মামলায় পার পেয়ে গেয়েছিলেম, তারও শাস্তি বোধ হয় এই বয়সে লম্বা আঙুল এঁকে শুধতে হচ্ছে সাধারণের দরবারে।

BANGLADARSHAN.COM

আর-একটা শাস্তির দাগ এখনো আছে লেগে আমার ঠোঁটে। গুড়গুড়িতে তামাক খাবার ইচ্ছে হল—হঠাৎ কোথা থেকে একটা গাড়ু জোগাড় করে তারই ভিতর খানিক জল ভরে টানতে লেগে গেলাম। ভুড় ভুড় শব্দটা ঠিক হচ্ছে, এমন সময় কি জানি পায়ের শব্দে চমকে যেমন পালাতে যাওয়া, অমনি শখের হুঁকোটার উপর উলটে পড়া! সেবার নীলমাধব ডাক্তার এসে তবে নিস্তার পাই—অনেক বরফ আর ধমকের পরে। দেখেছি যখন দুষ্টুমির শাস্তি নিজের শরীরে কিছু-না-কিছু আপনা হতেই পড়েছে, তখন গুরুজনদের কাছ থেকে উপরি আরো দু-চার ঘা বড়ো একটা আসত না। যখন দুষ্টুমি করেও অক্ষত শরীরে আছি তখনই বেত খেতে হত, নয় তো ধমক, নয় তো অন্দরে কারাবাস। এই শেষের শাস্তিটাই আমার কাছে ছিল ভয়ের—কুইনাইন খাওয়ার চেয়ে বিষম লাগত।

অন্দরে বন্দী অবস্থায় যে ক'দিন আমায় থাকতে হত, সে ক'দিন ছোটোপিসির ঘরই ছিল আমার নিশ্বাস ফেলবার একটিমাত্র জায়গা। 'বিষবৃক্ষ' বইখানিতে সূর্যমুখীর ঘরের বর্ণনা পড়ি আর মনে আসে ছোটোপিসির ঘর। তেমনি সব ছবি, দেশী পেনটারের হাতে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ যে লোহার সিন্দুকটা, সেটাও ছিল। কৃষ্ণনগরের কারিগরের গড়া গোষ্ঠলীলার চমৎকার একটি কাচঢাকা দৃশ্য, তাও ছিল। উলে বোনা পাখির ছবি, বাড়ির ছবি। মস্ত একখানা খাট—মশারিটা তার ঝালরের মতো করে বাঁধা। শকুন্তলার ছবি, মদনভস্মের ছবি, উমার তপস্যার ছবি, কৃষ্ণলীলার ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল ভর্তি। একটা-একটা ছবির দিয়ে চেয়ে-চেয়েই দিন কেটে যেত। এই ঘরে জয়পুরী কারিগরের আঁকা ছবি থেকে আরম্ভ করে, অয়েল পেনটিং এ কালীঘাটের পট

পর্যন্ত সবই ছিল; তার উপরেও, এক আলমারি খেলনা। কালো কাচের প্রমাণসই একটা বেড়াল, শাদা কাচের একটা কুকুর, ঠুনকো একটা ময়ূর, রঙিন ফুলদানি কত রকমের। সে যেন একটা ঠুনকো রাজত্বে গিয়ে পড়তেম। এ ছাড়া একটা আলমারি, তাতে সেকালের বাংলা-সাহিত্যে যা-কিছু ভালো বই সবই রয়েছে। এই ঘরের মাঝে ছোটোপিসি বসে বসে সারাদিন পুঁতি-গাঁথা আর সেলাই নিয়েই থাকেন। বাবামশায় ছোটোপিসিকে সাহেব-বাড়ি থেকে সেলাইয়ের বই, রেশম কত কী এনে দিতেন আর তিনি বই দেখে নতুন নতুন সেলাইয়ের নমুনা নিয়ে কত কী কাজ করতেন তার ঠিক নেই। ছোটোপিসি এক জোড়া ছোট্ট বালা পুঁতি গেঁথে গেঁথে গড়েছিলেন—সোনালি পুঁতির উপরে ফিরোজার ফুল বসানো ছোট্ট বালা দু'গাছি, সোনার বালার চেয়েও ঢের সুন্দর দেখতে।

বিকেলে ছোটোপিসি পায়রাদের খাওয়াতে বসতেন। ঘরের পাশেই খোলা ছাত। সেখানে কাঠের খোপে, বাঁশের খোপে, পোষা থাকত লক্‌কা, সিরাজী, মুক্ষি কত কী নামের আর চেহারার পায়রা। খাওয়ার সময় ছোটোপিসিকে ডানায় আর পালকে ঘিরে ফেলত পায়রাগুলো। সে যেন সত্যিসত্যিই একটা পাখির রাজত্ব দেখতেম—উঁচু পাঁচিল-ঘেরা ছাতে ধরা। বাবামশায়েরও পাখির শখ ছিল, কিন্তু তাঁর শখ দামী দামী খাঁচার পাখির, ময়ূর সারস হাঁস এই সবেরই। পায়রার শখ ছিল ছোটোপিসির। হাটে হাটে লোক যেত পায়রা কিনতে। বাবামশায় তাঁকে দুটো বিলিতি পায়রা এক সময়ে এনে দেন, ছোটোপিসি সে দুটোকে ঘুঘু বলে স্থির করেন, কিছুতেই পুষতে রাজী হন না। অনেক বই খুলেও বাবামশায় যখন প্রমাণ করতে পারলেন না যে পাখি দুটো ঘুঘু নয়; তখন অগত্যা সে দুটো রটলেজ সাহেবের ওখানে ফেরত গেল! এরই কিছুদিন পরে একটা লোক ছোটোপিসিকে এক জোড়া পায়রা বেচে গেল—পাখি দুটো দেখতে ঠিক শাদা লক্‌কা, কিন্তু লেজের পালক তাদের ময়ূরপুচ্ছের মতো রঙিন। এবার ছোটোপিসি ঠকলেন—বাবামশায় এসেই ধরে দিলেন পায়রার পালকে ময়ূরপুচ্ছ সুতো দিয়ে সেলাই করা। একটা তুমুল হাসির হররা উঠেছিল সেদিন তিনতলার ছাতে, তাতে আমরাও যোগ দিয়েছিলেম।

BANGLADARSHAN.COM

ঠাকুরপুজো, কথকতা, সেলাই আর পায়রা—এই নিয়েই থাকতেন ছোটোপিসি। একবার তাঁর তিনতলার এই ছাতটাতে, বাড়িসুদ্ধ সবার ফোটো নিতে এক মেম এসে উপস্থিত হল। আমাদেরও ফোটো নেবার কথা, সকাল থেকে সাজগোজের ধূমধাম পড়ে গেল। সেইদিন প্রথম জানলেম আমার একটা হালকা নীল মখমলের কোট-প্যাণ্ট আছে। ভারি আনন্দ হল, কিন্তু গায়ে চড়াবামাত্রই কোট-প্যাণ্ট বুঝিয়ে দিল যে আমার মাপে তাদের কাটা হয়নি। এই অদ্ভুত সাজ পরে আমার চেহারাটা কারো কারো অ্যালবামে এখনো আছে—রোদের ঝাঁজ লেগে চোখ দুটো পিটপিট করছে, কাপড়টা ছেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচি এই ভাব।

ফোটো তোলা আর বাড়ির প্ল্যান আঁকার কাজ জানতেন বাবামশায়। ড্রইং করার নানা সাজ-সরঞ্জাম, কম্পাস-পেনসিল কত রকমের দেখতেম তাঁর ঘরে! বাবামশায় কাছারির কাজে গেলে তাঁর ঘরে ঢুকে সেগুলো নেড়ে-চেড়ে নিতেম। ঠিক সেই সময় ফার্সি-পড়ানো মুনশী এসে জুটতেন। কথায় কথায় তিনি আলে, বে, পে, তে জিম—এমনি ফার্সি অক্ষর আমাদের শোনাতে বসতেন। মুনশীর দু-একটা বয়েৎ এখনো একটু মনে আছে—

‘গুলেস্তাঁমে যাকে হরিয়েক গুলকো দেখা, না তেরি সে রঙ্গ, না তেরি সে বূ হ্যাঁয়।” আর-একটা বয়েৎ ছিল সেটা ভুলে গেছি কেবল ধ্বনিটা মনে আছে—কবুতর্ বা কবুতর্ বাক্ বাবাজ! সেকালে ফার্সি-পড়িয়ে হয়ে কানে শরের কলম আর লুঙ্গি না হলে চলত না, মাথাও ঢাকাও চাই। ঠিক মনে পড়ে না কেমন সাজটা ছিল মুনশীর।

ডাক্তারবাবুর আসবার সময় ছিল সকাল ন’টা। অসুখ থাক বা না থাক, কতকটা সময় বাইরে বসে গল্পগুজব করে তবে অন্যত্র রোগী দেখতেন গিয়ে রোজই। সেখানেও হয়তো এমনি একটা বাঁধা টাইম ছিল ডাক্তারের জন্যে পান জল তামাক ইত্যাদি নিয়ে! আর-এক ডাক্তারসাহেব ছিল বরাদ্দ—তার নাম বেলি—সে রোজ আসত না, কিন্তু যখন আসত তখনই জানতেম বাড়িতে একটা শক্ত রোগ ঢুকেছে। তখন দেখতুম আমাদের নীলমাধববাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে, আর ইংরিজি কথার মাঝে মাঝে থেকে থেকে ‘ওর নাম কি’ কথাটা অজস্র ব্যবহার করছেন তিনি; যথা—‘আই থিংক্—ওর নাম কি—ডিজিটিলিস অ্যান্ড কোয়াইন—ওর নাম কি—ইফ ইউ প্রেফার আই সে ডক্টর কেলী’ ইত্যাদি।

সাহেবছাড়া হয়ে নীলমাধববাবু তাঁকে ডাক্তারই মনে হত না, মনে হত, একেবারে ঘরের মানুষ আর মজার মানুষ! বাঘমুখো ছড়ি হাতে, গলায় চাদর, বুকে মোটা সোনার চেইন, ডাক্তারবাবু ভালোমানুষের মতো এসে একখানা বেতের চৌকিতে বসতেন। চৌকিখানা আসত তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আবার সরেও যেত তাঁর সঙ্গেই। আমার প্রায়ই অসুখ ছিল না, কাজেই ডাক্তারের লাঠিটার বাঘমুখ কেমন করে কাত হয়ে চাইছে সেইটেই দেখতে পেতেম। ছোটো ছোটো লাল মানিকের চোখ দুটো বাঘের—ইচ্ছে হত খুঁটে নিই, কিন্তু ভয় হত—মা আছেন কাছেই দাঁড়িয়ে ডাক্তারের। এখনকার কালে কত ওষুধেরই নাম লেখে একটু অসুখেই, তখন সাতদিন জ্বর চলল তো দালচিনির আরক দেওয়া মিকশ্চার আসত—বেশ লাগত খেতে, আর খেলেই জ্বর পালাত। তিনদিন পর্যন্ত ওষুধ লেখাই হত না কোনো—হয় সাবুদান, নয় এলাচদানা, বড়ো জোর কিটিং-এর বন্‌বন্। তিনদিনের পরেও যদি উঠে না দাঁড়াতেম তবে আসত ডাক্তারখানা থেকে রেড মিকশ্চার। গলদা চিংড়ির ঘি বলে সেটাকে সমস্তটা খাইয়ে দিতে কষ্ট পেতে হত মাকে।

এখন নানা রকম শৌখিন ওষুধ বেরিয়েছে, তখন মাত্র একটি ছিল শৌখিন ওষুধ, যেটা খাওয়া চলত অসুখ না থাকলেও। এই জিনিসটি দেখতে ছিল ঠিক যেন মানিকে গড়া একটি একটি রুহীতনের টেক্কা। নামটাও তার মজার—জুজুবস্। এখন বাজারে সে জুজুবস্ পাওয়া যায় না, তার বদলে ডাক্তারখানায় রাখে যষ্টিমধুর জুজুবিস্—খেতে অত্যন্ত বিস্বাদ। অসুখ হলে তখন ডাক্তারের বিশেষ ফরমাসে আসত এক টিন বিস্কুট আর দমদম মিছরি। এখনকার বিস্কুটগুলো দেখতে, হয় টাকা, নয় টিকিট। তখন ছিল তারা সব কোনোটা ফুলের মতো, কেউ নক্ষত্রের মতো, কতক পাখির মতো। দমদম মিছরিগুলো যেন সোনার থেকে নিঙড়ে নেওয়া, রসে ঢালাই করা মোটা স্ক্রু একটা-একটা।

BANGLADARSHAN.COM

ডাক্তারের পরই—ঠন্‌ঠনের চটি পায়ে, সভ্যভব্য চন্দ্র কবিরাজ—তিনি তোশাখানা থেকে দপ্তরখানা হয়ে, লাল রঙের বগলী থেকে চটি বিলি করে করে উঠে আসতেন তেতলায় আমাদের কাছে। নাড়ি টিপে বেড়ানোই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ, কিন্তু নিত্য-কাজ। বুড়ো কবিরাজ আমার মাকে মা বলে যে কেন ডাকে তার কারণ খুঁজে পেতেম না।

আর একটি-দুটি লোক আসত উপরের ঘরে, তাদের একজন গোবিন্দ পাণ্ডা, আর একজন রাজকিষ্ট মিস্ত্রি। পাণ্ডা আসত কামানো মাথায় নামাবলি জড়িয়ে, কর্পূরের মালা, জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে। দাসীদের সঙ্গে আমরাও ঘিরে বসতেম তাকে। প্রথমটা সে মেঝেতে খড়ি পেতে শুনে দিত দাসীদের মধ্যে কার কপালে ক্ষেত্তরে যাওয়া আছে, না-আছে। তার পর প্রসাদ বিতরণ করে সে শ্রীক্ষেত্রের গল্প করতে থাকত পট দেখিয়ে। সেই পট, নামাবলি, কর্পূরের মালা সব ক'টার রঙ মিলে শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্র বালি পাথর ইত্যাদির একটা রঙ ধরেছিল মনটা। অল্প কয় বছর হল যখন পুরী দেখলেম প্রথম, তখন সেই-সব রঙগুলোকেই দেখতে পেলেম, যেন অনেক কাল আগে দেখা রঙ। নৌকো, পাল্‌কি, বালি, কাপড়—সমস্ত জিনিস শাদা, হলুদ, কালো ও নীল—চারটি বহুকালের চেনা রঙের ছোপ ধরিয়ে রেখেছে।

আর-একজন সাহেব আসত, তার নাম রুবারীয়ো। জাতে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী—মিশকালো। বড়োদিনের দিন সে একটা কেক নিয়ে হাজির হত। তাকে দেখলেই শুধোতেম—'সাহেব আজ তোমাদের কি?' সাহেব অমনি নাচতে নাচতে উত্তর দিত, 'আজ আমাদের কিসমিস।' সাহেবের নাচন দেখে আমরাও তাকে ঘিরে খুব একচোট নেচে নিতাম।

BANGLADARSHAN.COM

নতুন কিছু পাখি কিম্বা নিলেমে গাছ কেনার দরকার হলে, বৈকুণ্ঠবাবুর ডাক পড়ত। দেখতে বেঁটে-খাটো মানুষটি, মাথায় টাক; রাজ্যের পাখি, গাছ আর নিলেমের জিনিসের সংগ্রহ করতে ওস্তাদ ছিলেন ইনি। তখন স্যার রিচার্ড টেম্পল ছোটোলাট—ভারি তাঁর গাছের বাতিক। বৈকুণ্ঠবাবু নিলেমে ছোটোলাটের ডাকের উপর ডাক চড়িয়ে, অনেক টাকার একটা গাছ আমাদের গাছ-ঘরে এনে হাজির করলেন। ছোটোলাট খবর পেলেন—গাছ চলে গেছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে লাটের চাপরাশি পত্র নিয়ে হাজির—ছোটোলাট বাগান দেখতে ইচ্ছে করেছেন। উপায় কী, সাজসাজ বর পড়ে গেল। আমার মখমলের কোট-প্যাণ্ট আবার সিন্দুক থেকে বার হল। সেজে-গুজে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেম—ঘোড়ায় চড়ে ছোটোলাট এলেন। খানিক বাগানে ঘুরে একমাত্র চা খেয়ে বিদায় হলেন। বৈকুণ্ঠবাবুর ডেকে-আনা গাছটাও চলে গেল জোড়াসাঁকো থেকে বেলডেভিয়ার পার্কে।

বৈকুণ্ঠবাবুর বাসা ছিল পাথুরেঘাটায়, সেখান থেকে নিত্য হাজিরি দেওয়া চাই এখানে। একবার ঘোর বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ডুবে এক-কোমর জল দাঁড়িয়ে যায়। বৈকুণ্ঠবাবু গলির মোড়ে আটকা—অন্যের যেখানে হাঁটু জল বৈকুণ্ঠবাবুর সেখানে ডুব-জল—এত ছোট্ট ছিলেন তিনি।

কাজেই একখানা ছোট্ট পুকুর থেকে টেনে তুলে তবে তাঁকে চাকরেরা উদ্ধার করে আনে। ছোট্ট মানুষটি, কিন্তু ফন্দি ঘুরত অনেক রকম তাঁর মাথায়। কত রকমই যে ব্যবসার মতলব করতেন তিনি তার ঠিক নেই। একবার বড়ো জ্যাঠামশায় এক বাক্স নিব কিনে আনতে বৈকুণ্ঠবাবুকে হুকুম করেন। তিনি নিলেন থেকে একটা গোরুরগাড়ি বোঝাই নিব কিনে হাজির। আর-একবার একগাড়ি বিলিতি এসেন্স এনে হাজির বাবামশায়ের জন্যে। দেখে সবাই অবাক, হাসির ধূম পড়ে গেল। এই ছোট্ট মানুষটিকে প্রকাণ্ড ছাড়া ছোট্টখাটো স্বপ্ন দেখতে কখনো দেখলেম না শেষ পর্যন্ত। বিচিত্র চরিত্রের সব মানুষের দেখা পেলেম তিনতলা থেকে ছাড়া পেয়েই।

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM